অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১

নির্বাচনী ঘোষণা
ও
অঙ্গীকার

১১ দল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১

১১ দলের নির্বাচনী ঘোষণা ও অঙ্গীকার

নির্বাচনী ঘোষণা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ অপশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, লুটপাটের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠি তথা শাসক শ্রেণী সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও অবৈধ অর্থের ওপর ভর করে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও সম্পদ লুটেপুটে খাচ্ছে। দেশের তেল, গ্যাস, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ, রেল, চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বৃত্তায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ দেশকে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জনগণের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন ও জরুরি দাবিসমূহ আজ সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত। জনজীবনে বিরাজ করছে গভীর সঙ্কট। শাসক দলগুলোর নীতিহীন, আদর্শহীন, সন্ত্রাসী, নোংরা দলবাজির অসুস্থ অপরাজনীতির দাপটের মুখে দেশবাসী হতাশ ও উৎকণ্ঠিত। শাসক দলগুলোর এই অপশাসন ও ব্যর্থতা এবং জনগণের মধ্যে হতাশার সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট, চক্রান্তকারী শক্তিগুলো ক্রমেই জোরদার হয়ে এক বিপজ্জনক হুমকির সৃষ্টি করছে। এই অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ঘিরে গড়ে ওঠা দেশের শাসক শ্রেণীর বিদ্যমান দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ ও মেরুকরণের বাইরে দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, বামপন্থী, উদারনৈতিক, দেশদরদী, জনদরদী, বিবেকবান দল, ব্যক্তি ও শক্তির সমন্বয়ে বিকল্প শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলা আজ একান্ত আবশ্যক ও জরুরি কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। ১১ দল প্রবল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে ধৈর্য, সাহস, দৃঢ়তা ও নীতি-নিষ্ঠতার সঙ্গে 'বিকল্প' গড়ে তোলার এই কাজটিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

এই পটভূমিতে ৫ বছর পর আবারো একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

যে সকল মহান আদর্শ তথা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র আমাদের বীর জনগণকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও আত্মদান করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩০ বছর গত হলেও এখনো সেসব আদর্শ বাস্তবায়িত হয় নি। উপরন্তু ধারাবাহিকভাবে সেসব আদর্শকে একে একে

ধ্বংস করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে রচিত আমাদের সংবিধানের অমোঘ ঘোষণা 'জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক'। কিন্তু '৭২-এ রচিত সংবিধানের উপর্যুপরি অগণতান্ত্রিক সংশোধনী ও অসংখ্য কালা-কানুন জারির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতা হরণ করা হয়েছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংস্থা জাতীয় সংসদের গণতান্ত্রিক ও প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও নষ্ট করা হয়েছে। দীর্ঘ গণসংগ্রামের ফলে ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচিত করার যে অধিকারটুকুও দেশবাসী পেয়েছিল তাও আজ আক্রান্ত। নব্বই পরবর্তীকালে যে দুটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে তাও অধিকাংশ সময় অকার্যকর থেকেছে। কালো টাকা, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিনিধিরা ওই প্রতিষ্ঠানের দখলদারিত্ব নিয়েছে। সংসদ নির্বাচনে আজ বস্তুত সাধারণ জনগণের প্রার্থী হবার এবং নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার উপায় নেই।

দেশে যে লুটপাটের অর্থনীতি চলছে তার পরিণাম ফল হিসেবে রাজনীতি আজ তথাকথিত বড় দলগুলোর দ্বারা বহুলাংশে কেনা-বেচা, লাভ-লোকসান, লেনদেনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাজনীতিতে আদর্শ-নীতি-নৈতিকতা অপসৃত প্রায়। শাসন ক্ষমতায় এ যাবৎ অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের দুর্নীতি, লুটপাট, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, জনমত ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি উপেক্ষা, নীতিহীনতা, সর্বোপরি জাতীয় ও জনস্বার্থ বিরোধী আচরণের ফলে দেশবাসীর মনেও সৃষ্টি হয়েছে গভীর হতাশাবোধ।

সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। জনগণের কোনো অংশই এই সন্ত্রাসীদের থেকে নিরাপদ নয়। সন্ত্রাস নির্মূল করা হবে বলে সরব প্রচার চললেও এ যাবৎ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের মিত্ররা এইসব সন্ত্রাসীদের নিজেদের দলে আশ্রয় দিয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের অপরাধ আড়াল করেছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসীরাও দল-বদল করেছে।

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষে উঠে এসেছে। ক্ষমতার পালাবদলে এসব দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও তার বিচার শেষ হয় না। এই দুর্নীতিবাজরাই জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিসহ সংসদে তাদের নিয়ন্ত্রণমূলক স্থান করে নিচ্ছে। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ক্ষেত্রসহ সর্বব্যাপী দুর্নীতির কারণে মানুষ কার্যত অসহায়।

দেশের মানুষ কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করে জাতীয় প্রবৃদ্ধির যে উন্নতি সাধন করে চলেছে তার সিংহ ভাগই দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীরা আত্মসাৎ করছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করছে। নদী, লেক, খাল, বিল, জলাভূমি, বনাঞ্চল ইত্যাদি অবাধে দখল করে নিচ্ছে। এসব দখলদারীর কারণে দেশের সম্পদ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি প্রকৃতি-পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দারুণভাবে।

শাসক দলসমূহের দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্বের সুযোগে এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ধর্মের অপব্যবহারকারী, মৌলবাদী, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ আজ সংগঠিত ও হিংস্র রূপে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করা, তাদের সঙ্গে শাসক বড় দলগুলোর তথাকথিত কৌশলগত ঐক্য ও রাজনৈতিক মিত্রতা ও সর্বোপরি ভোটের জন্য সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিসমূহের সঙ্গে তাদের আপোষ নীতি দেশকে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফতোয়াবাজি, ধর্মের অপব্যাখ্যা ইত্যাদি সর্বত্রই চলছে। এসব শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানি ধাঁচের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য এবং এমনকি বাংলাদেশে তালেবানি শাসন কায়েমের জন্যও স্লোগান তুলছে।

এ যাবৎকালের ক্ষমতাসীন দলগুলো জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতা, দূরদৃষ্টিহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। এদের শাসনামলে বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কৃত তেল ক্ষেত্র বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। বিদেশী বহুজাতিক তেল কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত পিএসসি চুক্তির অসম শর্তের ফলে এখন নিজেদের গ্যাস আমাদের নিজেদেরই ডলার দিয়ে ডবলেরও বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। নির্বাচনের পর এই দু'দলের যেই ক্ষমতায় যাক, বাংলাদেশের গ্যাস দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে তা এই সব শাসকদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাগ্যবদলের বিনিময়ে বিদেশে চলে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এই শাসককুল দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। জাতীয় স্বার্থে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার পিসকোর এমনকি তার সেনাবাহিনীকে তারা ডেকে নিয়ে আসছে বারবার। বাংলাদেশকে এতদঞ্চলে মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে আজ পর্যন্ত সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয় নি। '৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি এখনো ভারত অনুমোদন করে নি। ফলে ছিটমহলগুলো নিয়ে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সীমান্তে সশস্ত্র হামলা, আক্রমণ, অনুপ্রবেশ ও সংঘাত ঘটে চলেছে। মায়ানমারের সীমান্তরক্ষীরাও বাংলাদেশের সীমানায় মাঝে মাঝেই হামলা চালায়। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত না হওয়ায় বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ অন্যরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া এবং বাংলাদেশের পাওনা সম্পদসহ পাকিস্তানের কাছে আমাদের প্রাপ্যসমূহ আজো আদায় হয় নি।

দুই দেশের মধ্যে পানি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সব সময় চুক্তি অনুযায়ী পানি পাওয়া নিশ্চিত হচ্ছে না। চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ এবং আরবিট্রেশনের বিধান না থাকায় এ বিষয়ে পদক্ষেপও নেয়া যাচ্ছে না। আরো ৫৩টি নদীর পানি বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এবং উজানে গ্রোয়েন ও বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পানির অভাব থেকেই যাচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা আজো উৎপীড়ন, বৈষম্য, অত্যাচারের শিকার। কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করা হলেও সম্পত্তির ওপর অংশিদারদের অধিকারকে অস্বীকার করে বঞ্চনার নতুন পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ওই এলাকায় যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটলেও ও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখন ওই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করে সেখানে সহিংস সংঘর্ষ, মারামারি, হানাহানি উস্কে দেয়া হচ্ছে। সমতলের আদিবাসীদের অধিকারের আজো স্বীকৃতি দেয়া হয় নি বরং নানা অজুহাতে আদিবাসীদেরকে জমি, গ্রাম ও বনভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বা আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেয়ায় বাংলাদেশের জাতিবৈচিত্র ও আদিবাসী জনগণ সবসময় হুমকির মুখে রয়েছে।

অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রেও চরম অব্যবস্থা, দুর্নীতি, লুটপাট চলছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও দাতা সংস্থাগুলোর নির্দেশে গত দুই দশক ধরে অনুসৃত নীতি দেশের শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে দেশকে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত করছে। ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ ও উদারীকরণ নীতি শিল্প ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। কৃষি উপকরণ ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেয়ায় উৎপাদনের খরচ ক্রমউর্ধ্বমুখী। অথচ কৃষক ফসলের উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না। ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৬৭ ভাগে পৌঁছেছে। ৩৩% কর্মক্ষম মানুষ বেকার অথচ কোনো বাজেটেই কর্মসংস্থানের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ৪৪% মানুষ দরিদ্র এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এসব লোকের সংখ্যা বার্ষিক মাত্র এক ভাগের কম হারে হ্রাস পাচ্ছে।

গ্রামীণ ক্ষেতমজুর-দিনমজুরের কাজ ও মজুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। শিল্প-শ্রমিকরাও তাঁদের মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত।

অর্থনীতিতে চোরাচালান ও কালো টাকার দৌরাত্ম বেড়েছে চরমভাবে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য বৈষম্য ছাড়াও চোরাচালান স্বাভাবিক বাণিজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম বাড়ছে চরম হারে। বিদ্যুৎ সঙ্কট, গ্যাস সঙ্কট, পানি সঙ্কট, যানজট, ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ, পরিবেশ দূষণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের উর্ধ্বগতি, নাগরিক নিরাপত্তাহীনতা সব মিলিয়ে দেশের মানুষ সামনে কোনো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি দেশের শাসন পরিচালনায় উন্নতি বিধানেই ব্যর্থ হয় নি, খোদ রাজনীতিকেই গণবিচ্ছিন্ন, গণবিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এই সুযোগে জামাতসহ স্বাধীনতা বিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তি দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র জোরদার করছে।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ শক্তি ও ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে এবং অপরদিকে বিএনপি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে

চায়। এর উভয়ের পরিণাম হবে অব্যাহত শাসন সঙ্কট, দুর্নীতি, লুটপাট, মাফিয়া রাজত্ব ও বিদেশী স্বার্থের কাছে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়া।

বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে অদম্য প্রাণশক্তি, হাজার বছরের ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংগ্রামী ইতিহাস, পর্যাপ্ত জনসম্পদ, উর্বরা জমি, সম্ভাবনাময় খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ— যা একটি প্রতিশ্রুতিশীল জাতি ও দেশ গঠনে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা বহন করে। অথচ এসব বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলগুলোর কোনো নজরই নেই।

দেশকে এই অবক্ষয় ও সঙ্কটের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লুটেরা শাসক শ্রেণীর এই দুই বিদ্যমান মেরুকরণের বাইরে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক দল, সংগঠন ও সচেতন নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল বিকল্প রাজনৈতিক ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১১ দল প্রয়াস নিয়েছে। সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জনজীবনের সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে হবে। ১১ দল সেই লক্ষ্যে দৃঢ় ও অবিচল থাকবে।

১১ দল এই আন্দোলনের ধারায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। নির্বাচনকে টাকার খেলা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত করে অবাধ নিরপেক্ষ পরিবেশে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগকে ১১ দল নিশ্চিত করতে চায়। জনগণই ক্ষমতার মালিক। ১১ দল জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে আন্দোলন, সংগ্রাম, নির্বাচন— সকল প্রক্রিয়ায় ১১ দল অবিচলভাবে এগিয়ে যাবে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১ দল নিম্নোক্ত অঙ্গীকারসমূহ নিয়ে দেশবাসীর সামনে হাজির হচ্ছে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার

১. সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়ন

ক. সকল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে, অস্ত্র কারখানা ও বোমা বানানোর কেন্দ্র ধ্বংস করতে, অস্ত্র-বোমার মজুদ উদ্ধারে, অপরাধী চক্রের ঘাঁটি ও নেটওয়ার্ক নির্মূলে, মাফিয়া-গডফাদারদের দমনে এবং অপরাধী চক্রের দেশী-বিদেশী অর্থ ও শক্তির উৎসসমূহ উৎপাটনে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা।

খ. রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী লালন করার ব্যবস্থা উৎপাটিত করা।

গ. চোরাচালানি, কালোবাজারি, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, পেশাদার অপরাধী-খুনি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ চক্রকে কঠোরভাবে দমন করা। আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসা ও স্মাগলিং রুট হিসেবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করার অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা।

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চতর স্থানসহ সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ন্যায়পাল ব্যবস্থা চালু করা। ঘুষ-দুর্নীতি ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঙ. সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, আইনগত সর্বশক্তি নিয়োজিত করার পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সংগঠিত করে তাকে একটি সর্বাত্মক জাতীয় অভিযান রূপে গড়ে তোলা।

২. দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদের বিকাশ

ক. নিরন্ন দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের জন্য বসতভিটার ব্যবস্থা ও খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা-সেবাসহ ন্যূনতম বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া। এই লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও সেসব কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা।

খ. কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য ক্রমান্বয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে বাজেটের ১২% বরাদ্দ করা। প্রাথমিকভাবে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এক-তৃতীয়াংশ উপজেলায় খরা মৌসুমে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম চালু ও পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারণ করা।

গ. বিকল্প মাথা গোঁজার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কাউকে তার বর্তমান বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা। গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামজীবনের আমূল পুনর্গঠন ও উন্নতি বিধান করে গ্রামের মানুষের ব্যাপকভাবে শহর অভিমুখী আগমন প্রবণতা মন্থর ও রোধ করা।

ঘ. মানব সম্পদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণসহ ব্যাপক কার্যক্রম অগ্রাধিকারমূলকভাবে গ্রহণ করা এবং এই খাতে সমন্বিত বাজেট বরাদ্দ সর্বাধিক করা। শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার প্রক্রিয়া শুরু করা। সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করা।

ঙ. দরিদ্র-অনাহারি-বেকার-অসহায় মানুষের জন্য ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা। সেই সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সামাজিক ও নাগরিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

৩. কৃষি, কৃষক, ক্ষেতমজুর

ক. খোদ কৃষক ও গ্রামের মেহনতি মানুষের স্বার্থে আমূল ভূমি সংস্কার, কৃষি সংস্কার ও গ্রাম জীবনের মৌলিক পুনর্গঠন করা। কৃষি ও কৃষকের উৎপাদন সমস্যাগুলো সমাধান করা। বীজ-সার-ঋণ-কৃষি উপকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদি খোদ কৃষকের জন্য সহজলভ্য করা। ক্ষতিকর হাইব্রিড বীজ আমদানি নিষিদ্ধ করা। কৃষি পণ্যের উৎসাহমূলক ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

খ. গ্রামাঞ্চলে কৃষি বহির্ভূত আর্থিক কর্মকাণ্ড এবং সে সব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিপুলভাবে বৃদ্ধি করা। ক্ষেতমজুরদের জন্য সারা বছর কাজ, 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম' চালু করা। প্রজেক্টের কাজে দুর্নীতি, গম চুরি দমন করা। স্বল্প মূল্যে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা। খাস জমির সকল অবৈধ বন্দোবস্ত বাতিল করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন নিশ্চিত করা।

গ. জলমহাল ও ভাসান পানিতে প্রকৃত জেলেদের মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ করা।

৪. শিল্প, শ্রমিক

ক. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অর্থনীতির বর্তমান অনুৎপাদনশীল লুটপাটের ধারা বন্ধ করে উৎপাদনশীল খাত ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

খ. বন্ধ কল-কারখানা চালু করা। পাট শিল্পকে রক্ষার জন্য কার্যকর বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. গার্মেন্টস শিল্পে কল-কারখানায় দুর্ঘটনা রোধ, শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত, ফ্যাক্টরি আইন পূর্ণভাবে কার্যকর এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা। জাতীয় নিম্নতম মজুরিসহ মজুরি কমিশনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ক্ষেতমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমজীবীদের জন্য বাঁচার মতো নিম্নতম মজুরি নিশ্চিত করা। জীবনযাত্রার ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে মিল রেখে মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু করা।

ঙ. আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী অর্জিত শ্রমিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা। ইপিজেডসহ সর্বত্র আইএলও কনভেনশন মোতাবেক শ্রমিক, কর্মচারী,

ক্ষেতমজুরসহ শ্রমজীবী জনগণের পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ওপর মাফিয়া গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও আমলাতান্ত্রিকতা দূর করে সাধারণ শ্রমিক, কর্মচারী, ক্ষেতমজুর, শ্রমজীবীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃত স্বার্থের স্বপক্ষে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা।

চ. বর্তমানের অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাতিল করে শ্রমিকদের অনুকূলে নয়া শ্রম আইন প্রণয়ন করা। শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করা। আদালতে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত নিষিদ্ধ করা। ১৯৬৫ সালের স্ট্যান্ডিং অর্ডার-এর ১৯ (ক) ধারা বাতিল করা।

৫. অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থাপনা

ক. অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করা। ঋণখেলাপি, অসৎ ও লুটেরা ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিতাড়িত করা, অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের হিসাব আদায় ও তা বাজেয়াপ্ত করা। দুর্নীতি, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ব্যয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি কঠোরভাবে দমন করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা। উৎপাদন অনুকূল সকল শক্তি ও উপাদান তথা কায়িক শ্রম, মানসিক শ্রম, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ প্রভৃতির ইতিবাচক অবদান নিশ্চিত করা। বিশ্ব বাজারের অসম প্রতিযোগিতার মুখে জাতীয় শিল্প-কারখানার স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করা।

খ. তেল-গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অসম ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে তুলে দেয়ার অপচেষ্টা রুখে দাঁড়ানো। বেসরকারি খাতে চট্টগ্রাম কন্টেইনারপোর্ট নির্মাণ এবং সে জন্য দেশের ভূখণ্ডকে তাদের কাছে লিজ প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

গ. ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা। রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে ব্যক্তিখাতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের শিল্প-ব্যবসার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সহায়তা প্রদান করা। উৎপাদন ও সেবামূলক খাত বিকাশের স্বার্থে ব্যক্তি, সমবায় ও অন্যান্য মিশ্র খাতকে সহায়তা প্রদান করা। শিল্পের ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা। তথ্য-প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজিসহ আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা এবং জাতীয়ভাবে এসবের ব্যবহারের ভিত্তি গড়ে তোলা। প্রবাসী বাঙালিদের অর্জিত আয়-উপার্জনকে দেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভিত্তিক পরিকল্পনা করে নিচ থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারা এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা। সকল পর্যায়ের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের, বিশেষত সংশ্লিষ্ট উৎপাদক, কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঙ. দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওরসহ সমস্ত পানি সম্পদকে একটি পানি ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনার অধীনে এনে তার সুদক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা। নদী ও পানি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

চ. তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের অনুকূলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং প্রকৃত সমতার ভিত্তিতে 'নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্বার্থ সম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা। বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার জন্য সচেষ্ট থাকা। ডব্লিউটিও, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যায় শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করা এবং শর্তাবলী জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অনুকূলে পরিবর্তন করার জন্য সব রকম প্রয়াস চালানো। গণতান্ত্রিক বিশ্বায়নের আওতায় শ্রমের অবাধ চলাচলের দাবিতে বিশ্বব্যাপী যে সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

ছ. সামরিক খাত ও মাথাভারি প্রশাসনসহ সকল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হ্রাস করা। জাতীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এ ধরনের পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় এমন পণ্যের ও বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা। ভোগবাদী প্রবণতা রোধ ও মিতব্যয়িতার ধারায় জাতীয় বিকাশের আন্দোলন তৈরি করে; ক্ষেত্রবিশেষে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

জ. সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস ছাড়াও, বর্তমানে ধনিক শ্রেণীর ওপর যে প্রত্যক্ষ কর রয়েছে তার পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ ও আদায় করা। বাজেটে সাধারণ জনগণের ওপর আরোপিত পরোক্ষ করের অনুপাত হ্রাস করা।

ঝ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর আয়-ব্যায়ের সকল হিসাব স্বচ্ছ রাখা এবং সরকার ও সেবা গ্রহীতাদের কাছে এনজিও পরিচালকমণ্ডলীর জবাবদিহিতার এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা করা।

করা। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা। তিন বছরের মধ্যে প্রতি দুই বর্গকিলোমিটারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮ বছরের মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার যথাযথ প্রসার ও উন্নতি সাধন করা। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৃত্তি ও শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা, পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা ও তাদের অন্যান্য ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করা। তাঁদের পেশাগত কাজে দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

খ. জনগণের সুষ্ঠু, মানবিক, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারা অগ্রসর করা এবং জীবন বিমুখ, ভোগবাদী, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ করা।

গ. সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, কুসংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা বিদূরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিকাশ ঘটানো। জনগণের সকল সৃজনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা ও উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো।

ঘ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, মানবতাবোধ ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা জাগরিত ও প্রসারিত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

ঙ. শিশু-কিশোরসহ দেশের নতুন প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা। শিশুদের সৃষ্টিশীল বিনোদনের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও কাঠামো গড়ে তোলা। শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থাদি গড়ে তোলা।

চ. দেশের যুব সমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা, হতাশাগ্রস্ততার মুখে মাদকাশক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস, নৈতিকতা-হীনতার গ্রাস থেকে মুক্ত করা। দেশ গঠনে যুব সমাজের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেয়া।

ছ. দেশের গ্রাম ও শহরের অসহায় বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, আবাসন কেন্দ্র, সেনিটোরিয়াম সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। অভিভাবকহীন দুঃস্থ মানুষের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ও জীবন ধারনের ব্যবস্থা করা।

৯. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

ক. সকল নাগরিকের জন্য সুষম ও অভিন্ন চিকিৎসা নীতি, স্বাস্থ্য নীতি ও ওষুধ নীতি চালু করা।

খ. প্রতিটি ইউনিয়নে মাতৃসদন, শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র ও গণস্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের সুবিধাদিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা। হাসপাতালগুলোতে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রসারিত করা এবং সেখানে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের জন্য চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

গ. বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশান, রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা।

ঘ. বিভিন্ন দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা। হোমিওপ্যাথি, বায়োক্যামি, আয়ুর্বেদী, হেকিমী ও অনানুষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

১০. নারী সমাজ

ক. নারী সমাজের ওপর পরিচালিত নানা অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য দূর করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলসহ সর্বক্ষেত্রে তাদের সমান অংশগ্রহণ, সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা সিডো সনদ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা। নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করা।

গ. প্রাথমিক পর্যায়ে নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ ও মজুরির ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। কর্মস্থলে শিশু পরিচর্য্যা কেন্দ্র স্থাপন করা। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঘ. সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ঙ. ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজ ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম থেকে গ্রামীণ নারী সমাজসহ মা-বোনদের রক্ষা করা। কর্মজীবী নারীদের জন্য ম্যাটারনিটি লিভ ও ৩ মাস সবেতন প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং গার্মেন্টসসহ সকল শিল্পে কর্মরত নারীদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, আবাসন ও যাতায়াত সুবিধা প্রদান, যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা, ছুটির ব্যবস্থা রাখা এবং বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হবার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. কন্যা শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ছ. পরিবারে ও গৃহস্থালী কাজে নারীর শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু

ক. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন, বৈষম্য, হয়রানি বন্ধ করা। তাদের জন্য সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু (অধিকার রক্ষা) কমিশন গঠন করা।

খ. কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করে যে আইন প্রবর্তিত হয়েছে, তা সংশোধন করে সম্পত্তির ওপর অংশীদারদের অধিকার নিশ্চিত করা।

গ. সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা।

১২. সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও আদিবাসী সমাজ

ক. সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর স্বকীয়তার পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

খ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার স্বার্থ রক্ষা, অধিকার নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান এবং বিকাশের জন্য এ সকল জাতিসত্তার মানুষদের প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির অসঙ্গতিসমূহ দূর করা এবং চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত ভূমি কমিশন সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের বাস্তুভিটা ও ভূমির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

ঙ. জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সমাজ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে ভূমি ও জীববৈচিত্র্য বিনাশকারী সকল ধরনের তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করা। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের অস্তিত্ব, পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবিকাকে বিপন্ন করে— এমন ধরনের তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা। যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. আদিবাসীদের ওপর হত্যা, খুন, অত্যাচার, উৎপীড়নের ঘটনার বিচার করা। সমতল ভূমির সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওঁরাওসহ সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার খাস জমি বণ্টনে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া।

ছ. সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। তাদের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষার পাশাপাশি তাদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৩. শহরের বস্তিবাসী ও নগরায়ন

ক. উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করা। দরিদ্র নিম্নবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প চালু করা। বস্তিবাসীর জন্য পৌর জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

খ. শহরের খাস জমি উদ্ধার করে সেখানে সরকারিভাবে কলোনি, ডরমিটরি ইত্যাদি নির্মাণ করে তা গরিব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ও বস্তিবাসীদের কাছে বসবাসের জন্য বিতরণ করা।

গ. দ্রুত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠা শহরগুলোতে পৌরসেবা কার্যক্রম ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। শহরতলির উন্নতি সাধন এবং দক্ষ কমিউটিং সার্ভিস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ. শহরগুলোতে যানজট, জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪. প্রতিবন্ধী জনগণ

ক. জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

খ. প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরিতে নিয়োগের কোটা নির্ধারণ, বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

গ. সকল সরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধী-অনুকূল করে নির্মাণ নিশ্চিত করা।

ঘ. মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৫. পরিবেশ

ক. জরুরি ভিত্তিতে দেশের আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ. যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি, মাটি ও বায়ু দূষিত করছে, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কল-কারখানার বর্জ্য নদী কিংবা জলাশয়ে ফেলা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা। নদী-খাল-বিল-লেক-জলাধার জবরদখলকারী, বন উজাড়কারী, বন দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পরিবেশ ধ্বংসকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই লেকের চারপাশে বাঁধ উঁচু করে নতুনভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটানোর উদ্যোগ বন্ধ, উন্নয়নের নামে পার্বত্য বন এলাকায় বন বিভাগের বন ধ্বংসকারী ও উন্নয়নবিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করা, পাহাড় কাটা ও ধ্বংস সাধন বন্ধ করা।

ঘ. ইকোপার্ক, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তোলার সময় আদিবাসীদের ওপর নিপীড়ন, তাদের জীবন-জীবিকাকে বিপন্নকরণ, বাস্তুচ্যুতকরণ ইত্যাদি পরিহার করা।

ঙ. বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীসহ দেশের সকল নদ-নদী এবং জলাধারের পাড় ও মধ্য থেকে অবৈধ স্থাপনাসহ অবৈধ দখল অবিলম্বে উচ্ছেদ করা। জাহাজ ভাঙা শিল্পের দ্বারা সমুদ্র ও উপকূলের পরিবেশ দূষণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চিংড়ি চাষ এলাকাসমূহের পরিবেশ-ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করা এবং পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থায় পরিকল্পিত চিংড়ি চাষের জন্য অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

চ. ঢাকাসহ অন্যান্য মহানগরে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সমস্যার উন্নতির জন্য টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত বেবি ট্যাক্সি নিষিদ্ধ করে সেগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা চালানোর উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান করা। এ ছাড়াও স্বল্পমূল্যের বিকল্প গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পরিবেশ দূষণ

কমাতে সকল ধরনের যানবাহনে ক্যাটালেটিক কনভার্টার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

ছ. সীসাবিহীন জ্বালানি তেলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ইস্টার্ন রিফাইনারির প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

জ. দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাবার জন্য পারমাণবিক চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাতিল করা। বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য বরং দেশের গ্যাস-জল-সৌরশক্তি-হাওয়া ইত্যাদি নিরাপদ উৎসগুলো ব্যবহার করা।

ঞ. ক্ষতিকর কীটনাশক সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণ করে তা জনগণকে জানানো এবং উন্নত বিশ্বে নিষিদ্ধ এ ধরনের কীটনাশক যাতে দেশে বাজারজাত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। নিষিদ্ধ কীটনাশক অসাধু পন্থায় আমদানি ও ব্যবহারের জন্য দায়ী আমদানিকারক, বাজারজাতকারী ও অনুমোদনকারীদের শাস্তি প্রদান করা।

১৬. বৈদেশিক সম্পর্ক

ক. স্বাধীন ও সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা। পারস্পরিক স্বার্থ, সমমর্যাদা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

খ. আন্তর্জাতিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গণতন্ত্রায়ন, জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থার গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিটি জাতির বিকাশের নিজস্ব পথ বাছাইয়ের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় প্রয়াস চালানো।

গ. স্থায়ী বিশ্ব শান্তি ও পূর্ণ নিরস্ত্রিকরণের জন্য দৃঢ় ও সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো।

ঘ. সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবাদ, জায়নবাদ, নব্য নাৎসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা এবং এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি ও আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা।

ঙ. তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে বহুমাত্রিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

চ. ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি এসব দেশের সঙ্গে ঝুলে থাকা সমস্যাগুলো, যথা ভারতের সঙ্গে সকল নদীর পানির বণ্টন, সীমানা চিহ্নিতকরণসহ বিরাজমান সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায় ও আটকেপড়া পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠানো ইত্যাদি সমস্যা জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাধান করা। উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করা এবং এ অঞ্চলে আত্মঘাতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ করা।

ছ. 'সার্ক' সংস্থার কার্যক্রমকে বহুমুখী ধারায় প্রসারিত করা এবং তার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত ও গভীরতর করা। 'সার্ক' দেশসমূহের জনগণ ও গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তি ও আন্দোলন-সমূহের মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা গভীরতর করা।

উপরে উল্লিখিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে সংসদের ভেতরে-বাইরে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে ১১ দল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।